Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 2, Issue-II, published on April 2022, Page No. 10 –16
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

বাংলা সাহিত্যে নারীর জীবনে বিবাহের প্রভাব ও পরিনতি

তৃপ্তি দাস
কলেজ শিক্ষিকা (Sect)
বাংলা বিভাগ, বীরভূম মহাবিদ্যালয়
ইমেইল: triptidas.kadipur@gmail.com

Keyword
বিবাহ, দেনাপাওনা, অপরিচিতা, স্ত্রীর পত্র, যোগাযোগ, উপন্যাস, বনফুল, তিলোত্তমা, গল্প, পুঁইমাচা

Abstract

Discussion
'বিবাহ' শব্দটি সুপ্রাচীন কাল থেকে আমাদের সমাজে সুপ্রচলিত। সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে দরকার পরবর্তী প্রজন্মের। আর এই নতুন প্রজন্মের জন্য প্রয়োজন সমাজ স্বীকৃত বিবাহ। 'বিবাহ' শব্দটির অর্থ হল বিশেষ রূপে বন্ধন। 'মনুসংহিতায়' মনু আট প্রকার বিবাহের কথা বলেছেন, যথা- ব্রাহ্ম, আর্য, দৈব, প্রজাপত্য, গান্ধর্ব, অসুর, পিশাচ, রাক্ষস। এরমধ্যে প্রজাপত্য বিবাহ আমাদের সমাজে বেশি দেখা যায়। সহজ ভাষায় বলতে গেলে বিবাহ হল দুটি হৃদয়ের বন্ধন। আরও প্রসারিত করে ভাবলে দুটি পরিবারের বন্ধন। কিন্তু সব বিবাহ বন্ধনই কি কল্যাণময় হয়? সব বিবাহ কি নরনারীর জীবনে মঙ্গলজনক? নাকি পৃথিবী থেকে চাঁদকে সুন্দর দেখালেও চাঁদের মধ্যে যেমন আছে গভীর ক্ষত, তেমনি বিবাহ বাইরে থেকে সুন্দর, শ্বাশ্বত, মঙ্গলময় একটা অনুষ্ঠান হলেও এর ভিতরে আছে পণপ্রথা নামক মারণ বীজ। বাংলা সাহিত্যের লেখকরা বারবার তুলে ধরেছেন এই পণপ্রথার বিষময় ফলটিকে। আলোচনার সুবিধার্থে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দেনাপাওনা', 'অপরিচিতা', 'স্ত্রীর পত্র' গল্প এবং 'যোগাযোগ' উপন্যাস, বনফুলের 'তিলোত্তমা' গল্প, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুঁইমাচা' গল্প, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'মীমাংসা' গল্প, এবং শরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'শ্রীকান্ত' ও 'বিরাজবৌ' উপন্যাসকে নেওয়া হল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি অন্যতম গল্প 'দেনাপাওনা'। এই গল্পে আমরা পাই বিবাহের এক অমানবিক ছবি। পাঁচ ছেলের পর একটি কন্যা জন্মালে বাবা-মা আনন্দে প্রচলিত নামের উর্ধ্বে গিয়ে মেয়ের নাম রাখেন নিরুপমা। পরে কন্যাকে সুপাত্রে পাত্রস্থ করতে গিয়ে নিজের সামর্থ্যের কথা না ভেবেই অধিক অর্থের বিনিময়ে রায়বাহাদুরের ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে ঠিক করেন। বিবাহ সভায় রায়বাহাদুর পাওনা-দেনার অসঙ্গতি লক্ষ্য করে বর উঠিয়ে নিয়ে যেতে মনস্থির করেন। কিন্তু ছেলের জন্য তার অভিলাষ ব্যর্থ হয়। তাই এই অপূর্ণ ইচ্ছার দাম দিতে হয় নিরু ও তার বাবা রামসুন্দরকে। শ্বশুর বাড়ি তার কাছে জতুগৃহ হয়। উঠতে বসতে তার কপালে জোটে লাঞ্ছনা আর অপমান। রামসুন্দরকেও বেহায় বাড়িতে যেতে হয় নতমস্তকে। বাড়ির চাকর বাকরও তাকে নিয়ে হাসাহাসি করে। বেহায় বাড়িতে

গিয়ে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পর দুত-চার মিনিটের জন্য কখনও মেয়ের দেখা পান, কখন শূন্যমনে ফিরে আসেন। মেয়ে একদিন বাবার কাছে আবদার করে একবারের জন্য বাড়ি যাবার। ফলে রামসুন্দরের পিতৃহৃদয় টনটন করে। বহু কষ্টে সামান্য কয়েকটি টাকা জোগাড় করে বেহায়ের হাতে তুলে দিতে চান। কিন্তু টাকার পরিমাণ দেখে রায়বাহাদুর তা নিতে অস্বীকার করেন এবং মেয়েকে পাঠাতে রাজি হননা। নিরুর শ্বাশুড়িও নিরুর উপর খুশি হতে পারেননি। তাই কেউ নববধূর প্রশংসা করলে শ্বাশুড়ি ঝংকার তুলে বলেন -

"শ্রী তো ভারি। যেমন ঘরের মেয়ে তেমনি শ্রী।" ১

কেউ নববধূ খাবার নিয়ে কথা বললে তিনি বলেন–

"ঐই ঢের হয়েছে।" ২

অর্থাৎ মেয়ের বাবা যদি পুরো পণদান মিটিয়ে দিতো, তাহলে মেয়েও পুরো যত্ন থাকতো।

মূলতঃ এই মানসিকতারই প্রকাশ ঘটেছে বনফুলে 'তিলোত্তমা' গল্পে। গোকুলের বাবা মোটা টাকার বিনিময়ে কালো কুৎসিত মেয়ে তিলোত্তমার সঙ্গে গোকুলের বিবাহ দিতে রাজি হয়। নববধূকে বরণ করতে গিয়ে গোকুলের মায়ের প্রতিক্রিয়া –

*"ভীমরতি ধরিয়াছে। তাহা না হইলে কেহ, সজ্ঞান নিজ পুত্রের জন্য ওই পেত্নীকে বউ করিয়া আনিতে পারে?"*৩

আসলে তিলোত্তমা সত্যি দেখতে খারাপ। গোকুলের বাবা শুধুমাত্র টাকার লোভে বিয়েতে রাজি হয়েছিল। কিন্তু যখন দেখলো তিলুর বাবা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলো না তখন সে বলে উঠলো –

"ও মেয়ে আমাকে দেখায়নি। আমি যে মেয়ে দেখেছিলাম, তার টকটকে রঙ, এক পিঠ চুল, দিব্যি চোখ মুখ, গোলগাল গড়ন।" ৪

এখানেই শেষ নয়, সে সিদ্ধান্ত নিলো –

"ছেলের আমি আবার বিয়ে দেব।" ৫

অবলীলায় মিথ্যা বললেও এতটুক অনুশোচনা হয়নি তার। সে ঊষা নামক এক মহিলার সঙ্গে গোকুলের বিবাহ স্থির করেছে। কারণ ঊষাকে বিয়ে করলে মিলবে একটা ছোটখাটো জমিদারি ও নগদ দশ হাজার টাকা। এতো পণের জন্য ঊষার মায়ের কলঙ্কও গায়ে মাখেনি সে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুঁইমাচা' গল্পে সহায়হরি একজন দরিদ্র গৃহস্থ। তার বড়ো মেয়ে ক্ষেন্তির বয়স ১৪-১৫ বছর হয়ে গেছে বলে গ্রামের লোক নানান কথা শুরু করেছে। এমনি সহায়হরিকে একঘরে করবে বলেও ঠিক করেছে। পাড়ার কয়েকজন ব্যক্তি একটা মাতাল, লম্পট ছেলেকে ক্ষেন্তির বিবাহের জন্য নিয়ে এসেছে। কিন্তু সহায়হরি রাজী হয়নি। এতে পাড়ার লোকেরা সহায়হরির উপর বিরক্ত হয়েছে। কারণ তাদের মতে পুরুষ মানুষের একটু বারদোষ থাকে। এটার জন্য বিবাহ ভেঙে দেওয়ার কোন অর্থই নাই। গ্রামের মানুষের চাপেই একসময় সহায়হরি তার থেকেও বয়সে বড়ো পাত্রের সঙ্গে ক্ষেন্তির বিবাহ দিয়েছে। আর ক্ষেন্তিকে হা-ঘরের মেয়ে বলে পদে পদে তারা অপমান করেছে। এমনকি বিবাহের কিছুদিন পর ক্ষেন্তি অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে ডঃ দেখানো দূরের কথা, গায়ের গয়নাগুলো খুলে নিয়ে সহায়হরির এক আত্মীয়ের বাড়িতে দিয়ে এসেছে। আর সেখানেই মারা গেছে ক্ষেন্তি।

'অপরিচিতা' গল্পে দেখি পাত্রের মামা হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়িয়েছে এমন একটি মেয়ের বাবাকে যার টাকা আছে কিন্তু তেজ নেই। অনেক খোঁজ খুঁজির পর মেঘ না চাইতে জলের মতো খুঁজে পেয়েছে কল্যাণী ও তার বাবাকে। কল্যাণীর বাবা ক্ষয়িষ্ণু জমিদার। তিনি পেশায় চিকিৎসক। তার আপনার বলতে একমাত্র কন্যা কল্যাণী। সুতরাং তার বিবাহ উপলক্ষে তার বাবা যে নিজের সব সঞ্চিত সম্পদ উপুড় করে দেবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। সুতরাং সানন্দে বিবাহে মত দিয়েছেন তারা। বিবাহ সভায় পাত্রীর গয়না ওজন করার জন্য নিয়ে এসেছেন স্যাকড়াকে। কন্যার বাবাকে নির্দেশ দিয়েছেন মেয়ের গা থেকে গয়না খুলে আনার । কারণ পাত্রের মামার সন্দেহ তাকে ঠকিয়ে বিবাহকার্য সম্পন্ন করতে পারে মেয়ের বাবা শম্ভুনাথবাবু। তাই তিনি এই পন্থা অবলম্বন করেছেন। কিন্তু তার এই অসভ্যতা মেনে নেননি মেয়ের বাবা শম্ভুনাথবাবু। তাই বিবাহ বাসর থেকে বর সহ বরযাত্রীদের বিদায় দিয়েছেন।

নিরুপমা তার শ্বশুরের অস্বাভাবিক দাবিকে সমথর্ন করতে পারেনি। তার বাবা সর্বশান্ত হয়ে তার শ্বশুরের চাহিদা মেটাক এটা তার কাছে কাঙ্খিত নয়। তাই তার বাবা যখন বাড়ি বিক্রি করে তার শ্বশুরকে টাকা দিতে চেয়েছে, তখন নিরুপমা বলে উঠেছে –

> *"বাবা, তুমি যদি আর এক পয়সা আমার শ্বশুরকে দাও, তা হলে আর তোমার মেয়েকে দেখতে পাবে না, এই তোমার গা ছুঁয়ে বললুম।"* ৬

নিরুপমা পণপ্রথার তীব্র বিরোধী। বাবার টাকার উপর মেয়ের সম্মান নির্ভর করবে এটা সে মেনে নিতে পারেনি।তাই বলেছে –

> *"তোমার মেয়ের কি কোন মর্যদা নেই। আমি কি কেবল একটা টাকার থলি, যতক্ষণ টাকা আছে ততক্ষণ আমার দাম। না বাবা, এ টাকা দিয়ে তুমি আমাকে অপমান করো না।"* ৭

এতো অসম্মান নিয়ে বাঁচার চাইতে তিলে তিলে নিজেকে শেষ করে দেওয়াটাকেই সে শ্রেয় মনে করেছে। কিন্তু বনফুলের 'তিলোত্তমা' গল্পের অন্যতম চরিত্র তিলুর মধ্যে এই আত্মমর্যাদা বোধ গড়ে ওঠেনি। 'বিমলার অভিমান' কবিতার ছোট্ট বিমলা যেটুকু অভিমান করতে পারে সেই অভিমানটুকুও সে করতে শেখেনি। আসলে আত্মসম্মান বা আত্মমর্যাদা বোধ তৈরি হওয়ার জন্য একটা পারিপার্শ্বিক পরিবেশের প্রয়োজন হয়, সেটা তিলু কখনো পায়নি। গল্প কথকের ভাষায়–

> *"না জানে লেখাপড়া, না জানে গান বাজনা, না জানে হাবভাব।"* ৮

শ্বশুর বাড়িতে এসে তার স্থান হয়েছে ছাই গাদায়। তাকে রান্নাঘরে প্রবেশ করতে দেয়নি তার শ্বাশুড়ি। বাইরের কাজ নিয়ে বাইরে বাইরেই তাকে থাকতে হয়েছে। কিন্তু তার জন্য তিলোত্তমার কষ্ট হয়েছে বলে মনে হয় না। লেখকের বর্ণনায় –

> *"বাহিরের কাজকর্ম লইয়াই থাকে এবং তাহাতে ডুবিয়া থাকে।"* ৯

তিলোত্তমার আত্মসম্মান নেই বলেই তার শ্বশুরের মিথ্যা ভাষন সে নির্বিকার চিত্ত মেনে নিয়েছে। শ্বাশুড়ির অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করেছে। শুধু তাই নয়, গোকুলের দ্বিতীয় বিবাহে আপত্তি করেনি। আপত্তি করার কোন সঙ্গত কারণই সে খুঁজে পায়নি। মধ্যযুগীয় মানসিকতা থেকে তার মনে হয়েছে পুরুষ তো নিজের ইচ্ছে মতো বিবাহ করতেই পারে। তাকে বাধা দিয়ে তো কোন লাভ নেই। প্রাচীন পন্থায় সে বিশ্বাসী বলেই গোকুলের ভাবি স্ত্রী ঊষার কথায় চিরকালের জন্য বাবার বাড়িতে থাকতে রাজি হয়েছে। এমনকি গোকুল যখন জানতে চেয়েছে, 'আচ্ছা, তোমার কোন আপত্তি নেই তো?' তখনও সে নীরব থেকেছে। আসলে জন্মের পর থেকে বঞ্চিত হতে হতে নিজের অধিকার দাবি করতে ভুলে গেছে সে। তিলোত্তমার নাম শুনে কল্পনায় বিভোর গোকুল যখন তিলোত্তমাকে প্রত্যক্ষ করেছে তখন স্বাভাবিক কারণেই স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে তার। তিলোত্তমার সঙ্গে আলাপ করেও তার মনের ক্ষুধা মেটেনি। তাই বলে উঠেছে –

> *"একটা চাকরাণীর সঙ্গে কাঁহাতক আর প্রেম করা যায়!"*১০

তিলোত্তমার সঙ্গে প্রেম করা যায় না এটা সত্য। আসলে ঊষার মতো মেয়েকে দেখার পর তিলোত্তমার সঙ্গে প্রেম করা সত্যিই অসম্ভব। কারণ ঊষা 'চলনে-বলনে-হাস্যে-কটাক্ষে বিদ্যুৎ; ঊষা ঊষা নয় দ্বিপ্রহর'। কিন্তু বাহ্যিক সৌন্দর্য সবকিছু নয়। মানুষের অন্তরের সৌন্দর্য মানুষকে বাঁচার রসদ জোগায়। তাই তিলু ও ঊষা দুজনকে খুব কাছাকাছি দেখতে দেখতে গোকুল দুজনের পার্থক্যটা বুঝতে পেরেছে। উপলব্ধি করেছে ঊষা কেবল মানুষের আনন্দ কেড়ে নিতেই শিখেছে, ত্যাগের শক্তি তার নেই। তিলুর মধ্যেই আছে দুঃখকে বরণ করার সাহস ও ত্যাগের শক্তি। গোকুল অনুভব করেছে বাহ্যিক সৌন্দর্য দিয়ে কখনো জীবন চলবে না। উপলব্ধি করেছে প্রেম আর বিবাহ এক নয়। বিয়ে হলো সারাজীবন একসঙ্গে থাকার অঙ্গিকার। আর সেই অঙ্গিকারকে সত্য করতে হলে ত্যাগে কুন্ঠাশূন্য হতে হবে। যা ঊষার পক্ষে কখনো সম্ভব নয়। শ্বাশুড়ির নির্দেশে তিলু যখন গোকুল ও ঊষার আর্শীবাদের দিন শাঁখটা বাজাতে শুরু করেছে তখন সেই শঙ্খের ধ্বনি গোকুলকে সচেতন করে তুলেছে। তাই মালা ছিঁড়ে ফেলে ভদ্র ভাষায় গোকুল ঊষাকে বলেছে 'আমাকে মাপ করবেন।' এরপর সবকিছু পিছনে ফেলে সোজা ওপরে উঠে গেছে।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে আমরা সুরলক্ষী ও রাজলক্ষ্মীর কথা জানতে পারি। এদের কুলিন বাবা দুটি বিবাহের পর তৃতীয় বিবাহ করে তাদের মাকে ঘর থেকে বের করে দেয়। ফলে তার মা সন্তানসহ বাবার

বাড়িতে ফিরে আসে। কিছু দিন পর তার মামা ভাগ্নীদের বিবাহের চিন্তায় ব্যস্ত হয়ে ওঠে। দত্তদের পাচক বামুনকে ধরে জাতি রক্ষা করতে চায়। সকলে দত্তদের পাচক বামুনকে হাবাগাবা ভাবতো। কিন্তু বিবাহের কথায় সকলে দেখলো সেই মানুষটির সংসারিক বুদ্ধি কারো থেকে কম নয়। তাই একান্ন টাকায় বিবাহ করতে হবে শুনে সে বলে উঠেছে –

> *"অত সস্তায় হবে না মশায় - বাজারে যাচিয়ে দেখুন। পঞ্চাশ - এক টাকায় একজোড়া ভাল রামছাগল পাওয়া যায় না- তা জামাই খুঁজচেন। একশ একটি টাকা দিন- একবার এ - পিঁড়িতে বসে আর একবার ও - পিঁড়িতে বসে, দুটো ফুল ফেলে দিচ্ছি। দুটি ভাগ্নীই একরাত্রে একসঙ্গে পার হবে। আর একশখানি টাকা- দুটো ষাড় কেনার খরচটাও দেবেন না?"* [১১]

এখানেই শেষ নয়, এক পিড়িতে দুটি মেয়েকে বিবাহ করে নগদ টাকা বুঝে নিয়ে সেই যে সে নিজ গ্রামে ফিরে গেছে, এরপর আর কখনো কেউ তাকে স্বচক্ষে এগ্রামে প্রত্যক্ষ করেনি। বিবাহের পরে সুরলক্ষী মারা গেছে, আর রাজলক্ষীকে নিয়ে তার মা কাশী রওনা হয়েছে। কাশী থেকেই রাজলক্ষীর জীবনে শুরু হয়েছে এক মর্মান্তিক দুঃখের পর্ব। রাজলক্ষীর মা তাকে এক মৈথিলী রাজপুত্রের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। কিছু দিন পর সেই রাজপুত্র মারা গেলে তার মা আবার হাজার টাকার বিনিময়ে তাকে আর এক মৈথিলী যুবকের কাছে বিক্রি করতে চেয়েছে। কিন্তু বারবার এই অন্যায়কে সহ্য করতে না পেরে পরিচিত এক দাদামশাই এর সাথে প্রথম ঘর ছেড়েছে রাজলক্ষী। এরপর সহজ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে চোরাপথে হারিয়ে গেছে সে; রাজলক্ষী থেকে হয়ে গেছে পিয়ারী বাঈজী। তার মা যখন সর্বত্র প্রচার করছে রাজলক্ষীর মৃত্যু হয়েছে তখন নিজ পরিচয়ে নিজ গ্রামে ফিরে যাওয়ার রাস্তা চিরকালের মতো বন্ধ হয়ে গেছে তার । নাম পরিচয় হারিয়ে তাকে বেঁচে থাকতে হয়েছে এক বুক যন্ত্রণা নিয়ে। আস্তে আস্তে সে পিয়ারী বাঈজী থেকে বঙ্কুর মা হয়ে উঠেছে। বঙ্কুর দিদিদের বিয়ে, বঙ্কুর পড়াশোনা এবং বঙ্কুর মায়ের সব দায়িত্ব তুলে নিয়েছে নিজের কাঁধে। প্রথম দিকে বঙ্কু তাকে নিজের মায়ের মতো ভালোবাসলেও বিয়ের পর তার আচরণ বদলে গেছে। তাই শেষ জীবনে তাকে বাড়ি ছাড়তে হয়েছে।

'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে পাই বিবাহকে কেন্দ্র করে আর এক হৃদয় বিদারক কাহিনী। বহু ভাষাভাষীর আবাসভূমি ভারতবর্ষ কোন দিনই জাতপাতের উর্ধ্বে উঠতে পারেনি। বিবাহ যেহেতু আমাদের প্রাচীন সংস্কার তাই আমরা সব সময় চায় নিজেদের স্বজাতির ঘরে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে। এমনকি সমাজের রক্তচক্ষুর ভয়ে অনেক সময় আমরা বাধ্য হয় অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিবাহে রাজী হতে। এই উপন্যাসেও আমরা দেখি বঙ্গবাসী গৌরী তিওয়ারি সুদূর বিহারের বিঠৌরা গ্রামের হিন্দুস্থানি পরিবারে দুটি মেয়ের বিবাহ দিতে বাধ্য হয়েছেন, শুধু মাত্র বঙ্গভূমে তিওয়ারি জাতির মানুষ নেই বলে। ফলে বর্ধমানের রাজগ্রাম থেকে মেয়ে দুটিকে পাড়ি দিতে হয়েছে বিঠৌরা গ্রামে। কিন্তু বিবাহ সূত্রে বিহারে বসবাস করলেও তাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছে। কারণ হিন্দুস্থানী খাদ্যাভ্যাসে তারা অভ্যস্ত নয়, অন্যদিকে হিন্দি ভাষা তাদের কাছে বোধগম্য নয়। তাই স্বভূমে ফিরে যাওয়ার জন্য শিকড়ের টানে তারা ছটফট করেছে। বড় মেয়েটির অবিরাম কান্নায় বিরক্ত হয়ে তার শ্বশুর বাড়ির লোকজন তাকে শাস্তি দিয়েছে। আর সেই অপমানে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে সে। এই সত্য চাপা দিয়ে মেয়েটির শ্বশুর বাড়ির লোকজন প্রচার করছে মেয়েটি অসুস্থ হয়ে মারা গেছে। শুধু তাই নয়, মেয়েটির বাবার বাড়ি থেকে আসা চিঠিপত্রের কথা তারা মেয়েদুটির কাছে গোপন রেখেছে। যে মেয়েটি বেঁচে আছে তার সারা শরীরে প্রহারের চিহ্ন। তাই একরত্তি মেয়েটা এক অচেনা সন্ন্যাসীর মুখে বাংলা ভাষা শুনে অঝোর নয়নে কেঁদে উঠেছে। কাতর আবেদন রেখেছে তিনি যেন তার বাবাকে সব জানান। আর তার বাবা যেন তাকে এখান থেকে নিয়ে যায়। তা না হলে সে দিদির পন্থা অনুসরণ করবে।

আজও আমাদের সমাজে মেয়েদের জীবনে বিয়েটাকেই বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়। তাই পুঁটুর বিয়ে ভেঙে যাওয়ার সকলে চিন্তিত হয়েছে। আসলে কালিদাস বাবুর মতো ধনী ব্যক্তির ছোট ছেলের সঙ্গে পুঁটুর মতো নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ের বিয়ে ভেঙে যাওয়ায় স্বাভাবিক। তাই সঙ্গত কারণেই বিয়েটা ভেঙে গেছে। এরপর পুঁটুর থেকে বয়সে বহু বড়ো শ্রীকান্তের সঙ্গে পুঁটুর বিয়ে দিতে ঠাকুরদা একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেছেন। শ্রীকান্তের মতামত সঠিক ভাবে না জেনেই বিয়ের কথা প্রচার করছেন তিনি। এমনকি পুঁটুকে নিয়ে শ্রীকান্তের কলকাতার বাড়িতে হাজির হয়েছেন।

আর শ্রীকান্ত যখন বিয়ের কথা অস্বীকার করেছে তখন গ্রামের পুরুষরা রাগে অস্থির হয়ে উঠেছে আর মেয়েরা শুরু করেছে কান্নাকাটি। পুঁটুর মা পুঁটুকে বলেছে–

> *"ও হতভাগী আমাদের সবাইকে খেয়ে তবে যাবে। ওর এমনি কপাল যে, ও চাইলে সমুদ্দুর পর্যন্ত শুকিয়ে যায়, -মরা শোল মাছ জলে পালায়। এমন ওর হবে না তো হবে কার?"* [১২]

এমনিতে বিবাহ ভেঙে যাওয়ার সংবাদে সে সবার চোখের আড়ালে মুখ লুকিয়েছে। তার উপর তার মায়ের এই অপমানে শ্রীকান্তের নিজেরই মনে হয়েছে –

> *"কি দুঃর্ভাগ্য লইয়াই ইহারা জন্মগ্রহণ করে?"* [১৩]

শরৎচন্দ্রের চট্টোপাধ্যায় 'বিরাজবৌ' উপন্যাসে দেখি বিবাহকে কেন্দ্র করে একটা পরিবার শেষ হয়ে গেছে। নিজের ক্ষমতার বাইরে গিয়ে নীলাম্বর তার বোনের বিয়ের ব্যবস্থা করেছিল। এমনকি বোনের বরের পড়াশোনার সমস্ত খরচ বহন করতে রাজী হয়েছিল। এরপর নিয়তির অভিশাপের মতো হঠাৎ শুরু হয়েছিল আজন্মা। ফলে পরপর দুটি বছর কোন ফসল উৎপন্ন হয়নি। চারিদিক দিয়ে ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে নীলাম্বর কোনঠাসা হয়ে পড়েছিল। তার বসত বাড়ি নিলামে উঠেছিল। সবকিছু হারিয়ে সে নিঃস্ব হয়ে যায়। ফলে সংসারে অভাবের অনিবার্য পরিণতি অশান্তি শুরু হয়। এমনকি নীলাম্বর ও বিরাজের অটুট ভালোবাসার বন্ধন ভেঙে খান খান হয়ে যায়। পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝি আর অমূলক সন্দেহের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে বিরাজ হারিয়ে যায় নিরুদ্দেশের পথে।

কিন্তু এই দুঃর্ভাগ্যকে সারা জীবন মেনে নিয়ে বেঁচে থাকেনা প্রতিটি মেয়ে। সহ্য করতে করতে যখন তাদের ধৈয্যর বাঁধ ভেঙে যায়, তখন তারা প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। এরকম একটা চরিত্র 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের অভয়া। পিতৃ-মাতৃহীন অভয়াকে তারা স্বামী একা ফেলে বর্মায় পাড়ি দেয়। কিছু দিন চিঠিপত্র ও টাকা পয়সা পাঠানোর পর বর্মায় অন্য এক মেয়েকে বিয়ে করে অভয়াকে ভুলে যায়। অভয়া বর্মায় এলেও তাকে তার স্বামী না চেনার ভান করে। পরে অনেকটা দায়ে পড়েই অভয়ার স্তুতি করে জীবন ও চাকরী বাঁচাতে চায়। চাকরির সমস্যার যখন সমাধান হয়ে যায় তখন আবার শুরু করে জিজ্ঞাসাবাদ। এমনকি স্বামীর বিনা অনুমতিতে অন্য পুরুষের সঙ্গে বিদেশে পাড়ি দেওয়ার সাহস দেখানোর জন্য নির্মম প্রহার করতেও পিছুপা হয়না। স্বামীর প্রতারণা, মিথ্যাচার এবং সতীন কাঁটা নিয়ে স্বামীর ঘর করতে রাজী হয়েছিল অভয়া কিন্তু যে মুহুর্তে তার স্বামী তাকে মিথ্যা সন্দেহে অত্যাচার করেছে সেই মুহূর্তে সে ফিরে এসেছে রোহিনীদার কাছে। উপলব্ধি করতে পারেছে মিথ্যা ভালোবাসা নিয়ে বাঁচার কোন স্বার্থকতা নেই। তার থেকে রোহিনীর ভালোবাসাকে গ্রহণ করে সম্মানের সঙ্গে বাঁচা অনেক শ্রেয়। তাই পুরাতন জীবনকে ভুলে নতুন করে বাঁচতে চেয়েছে সে; সাঁজাতে চেয়েছে স্বপ্নের সংসার। শ্রীকান্তকে বলেছে –

> *"একদিন আমাকে দিয়ে বিয়ের মন্ত্র বলিয়ে নেওয়া হয়েছিল- সেই বলিয়ে নেওয়াটাই কি আমার জীবনে একমাত্র সত্য, আর সমস্তই একেবারে মিথ্যা? এত বড় অন্যায়, এত বড় নিষ্ঠুর অত্যাচার কিছুই আমার পক্ষে একেবারে কিছু না? আর আমার পত্নীত্বের অধিকার নেই, আমার মা হবার অধিকার নেই- সমাজ, সংসার, আনন্দ কিছুতেই আর আমার কিছুমাত্র অধিকার নেই? একজন নির্দয়, মিথ্যাবাদী, কদাচারী স্বামী বিনা দোষে তার স্ত্রীকে তাড়িয়ে দিলে বলেই কি তার সমস্ত নারীত্ব ব্যার্থ, পঙ্গু হওয়া চাই?"* [১৪]

এখানেই থেমে থাকেনি অভয়া, সে আরও জানিয়েছে –

> *"এখন তার স্ত্রী, তার ছেলেপুলে, তার ভালবাসা কিছুই আমার নিজের নয়। তবুও তাঁরই কাছে তার একটা গনিকার মত পড়ে থাকাতেই কি আমার জীবন ফুলে- ফলে ভরে উঠে সার্থক হতো শ্রীকান্তবাবু? আর সেই নিস্ফলতার দুঃখটাই সারা জীবন বয়ে বেড়ানোই কি আমার নারী জন্মের সবচেয়ে বড় সাধনা? রোহিনী বাবুকে ত আপনি দেখে গেছেন? তাঁর ভালোবাসা ত আপনার অগোচর নেই; এমন লোকের সমস্ত জীবনটা পঙ্গু করে দিয়ে আর আমি সতী নাম কিনতে চাইনে শ্রীকান্তবাবু।"* [১৫]

আসলে পুরুষ প্রধান সমাজ সারা জীবন নিজের মতো করে নারীদের চালিত করেছে। তাই সমাজে 'সতী', 'পতিব্রতা' শব্দের এতো কদর। প্রাবন্ধিক অন্নদাশঙ্কর রায় প্রশ্ন তুলেছেন –

> *"নারীকে সহধর্মিণী বলা গেছে, কিন্তু পুরুষকে সহধর্মী বলা হয় না কেন?"* [১৬]

ইবসনের 'ডলস হাউস' নাটকের নায়িকা নোরা যথাযথ বলেছে, নারী প্রথমে মানুষ, পরে তার অন্য পরিচয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের নায়িকা মৃণালও একই কথা বলেছে। একজন মেয়ে জন্মের পর কখনো পরিবারের মুখে হাসি ফোটাতে পারেনা। এমনকি মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এলেও তাকে শুনতে হয় নানান মন্তব্য। মৃণাল ও তার ভাই একসঙ্গে অসুস্থ হলেও, যখন তার ভাই মারা গেছে আর সে বেঁচে উঠেছে তখন আত্মীয়রা বলেছে –

> *"মৃণাল মেয়ে কি না, তাই ও বাঁচলো, বেটাছেলে হলে কি আর রক্ষা পেত?"* [১৭]

মৃণাল যেমন রূপসী তেমনি বুদ্ধিমতী। তার শ্বশুর বাড়ির লোকজন তার রূপের কথা ভুললেও তার বুদ্ধির কথা ভুলতে পারেনি। তাই তাকে মেয়েজ্যাটা বলে গাল দেয়। কিছু দিন পর তার বড়ো জার বোন পিতৃ-মাতৃহীন বিন্দু অনেকটা নিরাশ্রয় হয়েই তাদের বাড়িতে আসে। মৃণালের শ্বশুর বাড়ির লোকজন একটা পাগলের সঙ্গে বিন্দুর বিয়ে দিয়ে দেয়। মৃণাল জানতে পেরে এই অন্যায়ের তীব্র প্রতিবাদ করে। বিন্দুকে কেন্দ্র করে এক গভীর সমস্যায় জড়িয়ে যায় মৃণাল। ফলে সংসারে নিত্য অশান্তি অনিবার্য হয়ে ওঠে। এই সমস্যা থেকে মৃণালকে মুক্তি দিতে এবং নিজে চিরকালের মতো মুক্তি পেতে বিন্দু গায়ে আগুন দিয়ে মারা যায়। বিন্দুর মৃত্যু মৃণালকে সচেতন করে দেয়। সে বুঝতে পারে যেখানে মনের মিল নেই সেখানে থাকার কোন অর্থ নেই। বাড়ির বৌ হয়ে বাঁচার কোন স্বার্থকতা নেই, যদি সে মানুষ হয়ে বাঁচতে না পারে। তাই শ্রীক্ষেত্র গিয়ে বিশাল সমুদ্রের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে নিজেকে আবিষ্কার করেছে –

> *"আজ পনেরো বছর পরে এই সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে জানতে পেরেছি, আমার জগৎ এবং জগদীশ্বরের সঙ্গে আমার অন্য সম্বন্ধও আছে।"* [১৮]

শুধু তাই নয়, স্বামীকে চিরকালের মতো মুক্তি দিয়ে পত্র পাঠিয়ে দিয়েছি শ্বশুর বাড়ির উদ্দেশ্যে –

> *"আমি আর তোমাদের সেই সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের গলিতে ফিরবো না। আমি বিন্দুকে দেখেছি। সংসারের মাঝখানে মেয়েমানুষের পরিচয়টা যে কি তা আমি পেয়েছি। আর আমার দরকার নেই।"* [১৯]

মৃণালের মতো আত্মসম্মানের তাগিদে ক্ষত বিক্ষত হতে দেখি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'যোগাযোগ' উপন্যাসের কুমুদিনীকে। স্বামী মধুসূদনের ব্যাভিচারকে সে মেনে নিতে পারেনি। এই বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের জন্যই স্বামী ও শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে দাদার কাছে ফিরে আসে কুমু। দাদা বিপ্রদাসের কাছে বলে -

> *"আমি ওদের বড় বৌ, তার কি কোন মানে আছে, যদি আমি কুমু না হয়।"* [২০]

যদিও কুমুকে মাথা নত করতে হয়েছিল পরিস্থিতির কাছে। মেনে নিতে হয়েছিল সামাজিক অনুশাসন। কিন্তু সামাজিক অনুশাসন সবমেয়ে সবসময় মেনে নেয় না। তাই মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'মীমাংসা' গল্পের শারিরীক ভাবে অসুস্থ মেয়েটি যখন দেখলো তার বাবার টাকার বিনিময়ে তার মতো পঙ্গু মেয়েকে একজন সুস্থ ছেলে বিয়ে করছে তখন তার বুঝতে অসুবিধা হয়নি, এখানে দুটি মানুষের বিয়ে হচ্ছে না, বিয়ে হচ্ছে টাকার সঙ্গে মানুষের। তাই সে বিয়ের সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছে। তার বাবা জোর করেও তাকে বিয়ে দিতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অপরিচিতা 'গল্পের কল্যাণী বিবাহ বাসর থেকে উঠে আসতে পেরেছিল। বিবাহ ছাড়া নারী জীবন ব্যার্থ- একথা নাস্যাৎ করে দিয়ে বাচ্চা বাচ্চা মেয়েদের নিয়ে শুরু করেছিল স্কুল। দেশমাতৃকার সেবায় আত্মনিয়োগ করে খুঁজে নিয়েছিল জীবনের স্বার্থকতা। গল্পের নায়ক নিজের ভুল বুঝতে পেরে মাতুলকে দূর করে দিয়ে কল্যাণীর বাবার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল নত মস্তকে। কল্যাণীর বাবা তাকে ক্ষমা করে দিয়ে মেয়েকে তার হাতে তুলে দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু কল্যাণী রাজী হয়নি। সে পরিস্কার জানিয়েছে –

> *"আমি বিবাহ করিব না।"* [২১]

দিন যায়, বছর যায়। বদলে যায় মানুষের পোশাক-পরিচ্ছদ, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ। কিন্তু মন ও মানসিকতার ক্ষেত্রে আমরা যে তিমিরে ছিলাম, সেই তিমিরেই থেকে যায়। তাই স্বাধীনতার এতো বছর পরেও আজও সংবাদপত্রের পাতা খুললেই আমাদের চোখে পড়ে গৃহবধূ হত্যা। আজ হয়তো পরিসংখ্যানের বিচারে ছাত্রদের থেকে ছাত্রীরা শিক্ষা ক্ষেত্রে অনেক বেশি এগিয়ে, কিন্তু এই এগিয়ে থাকা ছাত্রীদের সবার লক্ষ্যই কি স্বনির্ভর হওয়া? নাকি বাবার কষ্টার্জিত

টাকায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া? আসলে ছোটবেলা থেকেই বৌ সাজিয়ে যে স্বপ্ন তাদের দেখানো হয়, বা বাড়িতে মাকে সংসারের কাজে ব্যাস্ত দেখে ছোটবেলায় পুতুলের বিয়ে দিয়ে যে খেলাঘর সে পাতে, তখন থেকেই তার মনের গহীন কোনে লালিত হয় বিবাহের স্বপ্ন। শুধুমাত্র অশিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিত মেয়েরাই নয়, স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত মেয়েরাও বিবাহটাকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য মনে করে দামী আসবাব, গয়নার বিনিময়ে বিবাহে রাজী হয়। আর আমরা কিছু মেয়েরা অসভ্যের মতো পুরুষদের কথার সূত্র ধরে পণপ্রথাকে সমর্থন করি। আমরা শিক্ষিত স্বনির্ভর মেয়েরা চাইনা বলেই হয়তো সমাজের কোন পরিবর্তন হয়না। আর এর ফল ভোগ করতে হয় সমস্ত মেয়েদের।

তথ্যসূত্র :

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ (অখণ্ড), করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ২০০২, পৃ. ৪৯৬
২. ঐ, পৃ. ৪৯৭
৩. ভট্টাচার্য, অধ্যাপক জগদীশ (সম্পাদনা), বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প, বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা-১২,পঞ্চম মুদ্রণ, আষাঢ়, ১৩৬৩, পৃ. ১৭৭
৪. ঐ, পৃ. ১৭৭
৫. ঐ, পৃ. ১৭৮
৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ (অখণ্ড), করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ২০০২, পৃ. ৪৯৮
৭. ঐ, পৃ.৪৯৯
৮. ভট্টাচার্য, অধ্যাপক জগদীশ (সম্পাদনা), বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প, বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা-১২, পঞ্চম মুদ্রণ, আষাঢ়, ১৩৬৩, পৃ. ১৭৮
৯. ঐ, পৃ. ১৭৮
১০. ঐ, পৃ. ১৭৯
১১. সোম, অধ্যাপক শোভন (সম্পাদনা), শরৎ সাহিত্য সমগ্র (প্রথম খন্ড), রামকৃষ্ণ পুস্তকালয়, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ-২০০৮, পৃ. ৪২৭
১২. ঐ, পৃ. ৪৫০
১৩. ঐ, পৃ. ৫৫১
১৪. ঐ, পৃ. ৫১০
১৫. ঐ, পৃ. ৫১১
১৬. দাশগুপ্ত, ধীমান (সম্পাদনা), প্রবন্ধ সমগ্র, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ-১৪০৫, পৃ. ৭৭
১৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ (অখণ্ড), করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ-২০০২, পৃ. ৪৯৬
১৮. ঐ, পৃ. ৪৯৭
১৯. ঐ, পৃ. ৪৯৮
২০. রবীন্দ্র রচনাবলী, দশম খন্ড, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৪১৩, পৃ. ২৫০
২১. গল্পগুচ্ছ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ-২০০২, পৃ. ৩৬০

সহায়ক গ্রন্থ :

১. উজ্জ্বল কুমার মজুমদার, (সম্পাদনা), গল্পচর্চা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ২০১৮
২. অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, কালের পুত্তলিকা
৩. চৈতালী দত্ত (সম্পাদনা), মনুসংহিতা, নবপত্র প্রকাশনা, কলকাতা-৭০০০০৯